নিজের স্বার্থে ফিলিস্তিনিদের বিপক্ষে আমেরিকা: মানবাধিকার কোথায়?

বাংলাদেশে মানবাধিকারের ইস্যু তুলে বারবার সরকারকে কাঠগোড়ায় তোলার চেষ্টা করে যুক্তরাষ্ট্র। অথচ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কিছুই বলেনা আমেরিকা। ইসরায়েলের বিমান হামলায় এ পর্যন্ত অন্তত ২৫০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। প্রাণ গেছে শিশু-নারীদের। মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে নিশ্চুপ ওয়াশিংটন।

সমুদ্র উপকূলীয় ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজাকে দীর্ঘদিন ধরেই ইসরায়েল অবরুদ্ধ করে রেখেছে। প্রায় বিচ্ছিন্ন এই ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে সশস্ত্র গ্রুপ হামাস। হামাসের রকেট হামলার জবাবে প্রায়ই ইসরায়েলি বাহিনী স্থল ও আকাশপথে ভারী অস্ত্র ব্যবহার করে। ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ করা হামাস গ্রুপ শনিবার ভোর থেকে স্থল, জল ও আকাশপথে সমন্বিত হামলা করে ইসরায়েলে। এদিকে হামাসের হামলার পর গাজায় পাল্টা বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এ পর্যন্ত কমপক্ষে ২৫০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

ইসরায়েলে এ হামলার নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো। হামাসের এ হামলাকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ আখ্যা দিয়ে প্রতিরক্ষা সমর্থনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির জাতীয় জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র অ্যাড্রিয়েন ওয়াটসন বলেন, ‘আমরা ইসরায়েলের সরকার ও জনগণের সঙ্গে আছি। এই হামলায় ইসরায়েলিদের প্রাণ হারানোর জন্য সমবেদনা জানাচ্ছি।’ হোয়াইট হাউসের বিবৃতিতে বলা হয়, ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের উপদেষ্টা জাচি হানেগবির সঙ্গে কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের উপদেষ্টা জেক সুলিভান।

শনিবার বাইডেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে ফোন কল করে বলেন, ‘আমরা ইসরায়েলের সরকার ও জনগণকে সব ধরনের সমর্থন দিতে প্রস্তুত আছি।’ পরে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘সন্ত্রাস কখনই ন্যায়সংগত হতে পারেন না। ইসরায়েলের নিজেকে এবং তার জনগণকে রক্ষা করার অধিকার রয়েছে।’ এই পরিস্থিতিতে ইসরায়েলের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কোনো পক্ষ সুবিধা নিতে চায় কি না সে ব্যাপারেও

সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

১৯৬৭ সালের পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের মধ্যকার সম্পর্ক দ্রুতগতিতে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে। ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় মার্কিনীরা ইসরায়েলের পক্ষ নেয়। এই সিদ্ধান্ত দুই দেশের সম্পর্কের মজবুত ভিত্তি রচনা করে। তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও কূটনীতিকরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব কমাতে ইসরায়েল তাদের কার্যকরী এক অস্ত্র হতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে স্নায়ুযুদ্ধের সময় থেকেই ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র আরো ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। এই যুদ্ধে মার্কিনরা বেশ সফলতাও অর্জন করে এবং নিজেদের বিশ্বের একমাত্র সুপারপাওয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

যুক্তরাষ্ট্র বুঝতে পারে, মধ্যপ্রাচ্যে তাদের এমন একটি মিত্র দরকার, যারা তাদের প্রতিরূপ হিসেবে কাজ করবে। কারণ মধ্যপ্রাচ্যের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক দূরত্বের একটি বিষয় ছিল। সেই সমস্যা নিরসনে শক্ত ঘাঁটি বিনির্মাণের জন্যই তারা বেছে নেয় ইসরায়েলকে। যুক্তরাষ্ট্র তখন ইসরায়েলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরির জন্য তাদের হয়ে ফিলিস্তিনের সাথে দেনদরবার করার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের আশ্বাসের কারণেই এখনো ইসরায়েল যেকোনো শান্তি আলোচনার টেবিলে বসতে রাজি হয়। বিগত তিন মার্কিন প্রেসিডেন্টই চেষ্টা করেছেন ফিলিস্তিনের সাথে ইসরায়েলের একটি সুরাহা করার। তবে এক্ষেত্রে তাদের সমর্থনের পাল্লা তেল আবিবের দিকেই বেশি থেকেছে। যুক্তরাষ্ট্র সবসময়ই ইসরায়েলের অনেক অপরাধ দেখেও না দেখার ভান করে থেকেছে, যা অব্যাহত রয়েছে বর্তমানেও। কিন্তু এর পেছনের রহস্য কী? শুধু মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য তারা ইসরায়েলকে সমর্থন করে, নাকি আরো কোনো কারণ রয়েছে?

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সম্পর্ককে বিশ্বের অন্যতম ব্যয়বহুল কূটনৈতিক সম্পর্কও বলা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রভাব সৃষ্টির জন্য ইসরায়েল যেমন প্রচুর অর্থ ব্যয় করে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রও তাদের বড় অঙ্কের আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। তবে এরপরও দুই দেশের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে, যেখান থেকে লাভবান হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

১৯৮৫ সালে ইসরায়েলের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করে

যুক্তরাষ্ট্র। এরপর থেকে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের হার অনেক বেড়েছে। ইসরায়েলে থাকা মার্কিন দূতাবাসের তথ্যমতে, ২০১৬ সালে দুই দেশ প্রায় ৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ব্যবসা করেছে, যা থেকে সিংহভাগ লাভবান হয়েছে মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলো। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২৪ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে ইসরায়েল।

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ইসরায়েল বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি বাজার। দেশটির বিভিন্ন রাজ্য ইহুদিপ্রধান দেশটির সাথে বিভিন্ন ব্যবসা করে আসছে, যা থেকে সামগ্রিকভাবে মার্কিন অর্থনীতি লাভবান হচ্ছে। বলা হয়ে থেকে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রকে তার কল্পনার চেয়েও অনেক বেশি দিয়েছে। এর প্রতিদান অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রও কম দিচ্ছে না!

এছাড়াও আরো গভীরে গেলে দেখা যায় যে, আমেরিকার রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করে মূলতঃ কর্পোরেট হাউজগুলো। তারা প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত বানাতে পারে, সরাতে পারে। এসব কর্পোরেট হাউজগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় এদের মালিক কিংবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কম্পানিগুলোর মূল দায়িত্বে থাকা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা চীফ এক্সজিকিউটিভ অফিসার, সিইও হলেন ইহুদি কমিউনিটির মানুষ।

২০২০ সালে, যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে ৩.৮ বিলিয়ন (৩৮০ কোটি) ডলার সাহায্য দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ওবামার শাসনামলে ইসরায়েলকে দীর্ঘমেয়াদী যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার অধীনেই এই সাহায্য গেছে। প্রায় পুরোটাই ছিল সামরিক সাহায্য।

২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট ওবামা ইসরায়েলের সাথে এক চুক্তি সই করেন যার অধীনে ২০১৭-১৮ সাল থেকে তার পরবর্তী ১০ বছর ইসরায়েল ৩৮ বিলিয়ন ডলার বা ৩৮০০ কোটি ডলার সামরিক সাহায্য পাবে। তার আগে দশ বছরের তুলনায় ঐ সাহায্য বেড়েছে প্রায় ছয় শতাংশ।
এ বাদেও, গত বছর ইসরায়েলে নতুন অভিবাসীদের পুনর্বাসনে যুক্তরাষ্ট্র ৫০ লাখ ডলার সাহায্য দিয়েছে। বিশ্বের যে কোনো দেশ থেকে ইহুদিরা ইসরায়েলে গিয়ে বসতি গড়তে চাইলে তাকে স্বাগত জানানোর নীতি বহুদিন ধরে সেদেশে রয়েছে।

ইসরায়েলকে অত্যাধুনিক একটি সামরিক শক্তিধর দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে আমেরিকা বছরের পর বছর ধরে সাহায্য করছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র কেনার জন্য তহবিল যোগানো হচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ, ইসরায়েল আমেরিকা থেকে ৫০টি অত্যাধুনিক এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান কিনেছে যা দিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো যায়। প্রতিটি বিমানের দাম প্রায় ১০ কোটি ডলার। ইসরায়েল আমেরিকার কাছ থেকে ২৪০ কোটি ডলার ব্যয়ে আটটি কেসি-৪৬এ বোয়িং ‘পেগাসাস‘ বিমান কিনেছে। এই বিমান থেকে আকাশে এফ-৩৫ বিমানে জ্বালানি তেল ভরা যায়।

২০২০ সালে ইসরায়েলকে আমেরিকা যে ৩৮০ কোটি ডলার দিয়েছে, তার মধ্যে ৫০ কোটি ডলার খরচ হয়েছে ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র নিরাপত্তা ব্যবস্থায়। এর মধ্যে রয়েছে ‘আয়রন ডোম‘ ক্ষেপণাস্ত্র নিরাপত্তা যা দিয়ে ইসরায়েল রকেট হামলা প্রতিহত করে। ২০১১ সাল থেকে আমেরিকা ইসরায়েলের ‘আয়রন ডোম‘ নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য ১৬০ কোটি ডলার দিয়েছে। এ ছাড়াও, গাজায় গোপন সুড়ঙ্গ শনাক্ত করা সহ বেশ কিছু সামরিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তৈরিতে আমেরিকা ইসরায়েলকে তহবিল ছাড়াও বিভিন্নভাবে সাহায্য করছে। ইসরায়েলের সরকার সমরাস্ত্র কেনা এবং সামরিক প্রশিক্ষণে বহু টাকা খরচ করে যার অনেকটাই আসে আমেরিকার দেওয়া সাহায্য থেকে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পেছনে আমেরিকান ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি (আইপ্যাক)-এর অবদানকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আইপ্যাক কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয়। কিন্তু এরপর তাদের যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের উপর বড় প্রভাব রয়েছে। মার্কিন সরকারের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিভিন্ন সিদ্ধান্তে তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে থাকে। কিন্তু তারা এই কাজ করে কীভাবে?

‘কংগ্রেশনাল ক্লাব’ নামে আইপ্যাকের বিশেষ একটি দল আছে। এই দলের প্রত্যেক সদস্য প্রতি নির্বাচনে সর্বনিম্ন পাঁচ হাজার ডলার চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর এই অর্থ ইসরায়েলপন্থী রাজনীতিবিদদের নির্বাচনে ব্যয় করা হয়। পরবর্তীতের এদের মধ্যে যারা জয়লাভ করে, তাদের মাধ্যমে সিনেট এবং হাউজে প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের নীতির বাস্তবায়ন করে। তবে আইপ্যাক সামগ্রিকভাবে কত অর্থ ব্যয় করে, সেই সম্পর্কে জানা যায় না। তবে তাদের এমন কিছু সদস্য আছে, যারা এক মিলিয়ন থেকে শত মিলিয়ন পর্যন্ত অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে। আর এই সকল দাতাদের ধ্যান-ধারণা সবই ইসরায়েলকে ঘিরে। তারা যেকোনো মূল্যে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলকে টিকিয়ে রাখতে চান।

শুধুমাত্র ট্রাম্পের শাসনামলেই আইপ্যাক অনেকগুলো সফলতা অর্জন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণা,